এক সর্বকালীন মানবতার স্বপ্নদ্রষ্টা

রথীন কর

'আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয়' গ্রন্থে ড: দীপ্তি ত্রিপাঠী যাঁকে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীর মতো আধুনিক কবির স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে সংকিত করেছেন তিনি। তার নাম কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, ড: শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতটি অবশ্য ভিন্নধর্মী। '১৩৩০ সালের পর হইতে নবধারার বাংলা কবিতায় যাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহারা হইলেন জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই কবি গোষ্ঠীকেই আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কবি বলিয়া অভিহিত করা চলে। নুতন যুগের সংশয়—সন্দেহ, জীবনের প্রতিপদে জিজ্ঞাসা-যুক্তির দাবি—বিদ্রোহ বিক্ষোভ ইহা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও স্পষ্ট এবং অকপট (যতীন্দ্রনাথ ও বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়। পৃ: ২৫৪-২৬২)। সমসাময়িক কবি কথাকার সাহিত্য সমালোচক যিনি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার প্রণেতাপুরুষ বলে স্বীকৃত সেই বুদ্ধদেব বসুর প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে মূল্যায়ণ— He has ample variety though not profession, quick, esisp, and sparkling, he flits from mood to movd and just seems to fit in everywhere. He is one of our earlist practitioners–one might say pioneers– of the prosepoem, no wonder that his verse prefers the spoken, even that colloquial diction. (An Arc of green grass (p-60), অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁকে অভিহিত করেছেন, 'a broken hearted dreamer, still hoping for the best from a revolution (Bengali Literature Annada Sankar Ray & Lala Ray P 85)। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতাভবন' থেকে প্রকাশিত আবুসয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন গ্রন্থে সম্পাদকদ্বয় আধুনিক কবির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রেমেন্দ্র মিত্রর চারটি কবিতা সংকলিত করেছেন। পরবর্তীকালে ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে ও শ্রীমিত্রর দুটি কবিতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এইসব বিপ্রতীপ বক্তব্য ও ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিকৃতি আলোচনার পূর্বে তাঁর বিচিত্র জীবনচর্চার দিকে আলোক-পাত করা যেতে পারে। কবিকে পাবে না তার জীবনচরিত—এই আপ্তবাক্যটি মেনে নিয়েও বলতে হয় কবি কথাকারের সৃজন তাঁর জীবন ও কর্মের প্রেক্ষাপটটি পর্যালোচনা করলে তাঁর সৃষ্টির রসাস্বাদন অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। বহিরঙ্গীণ জীবন অনেকাংশে অন্তর্লীন জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। সেক্ষেত্রে কবি জীবন ও ব্যক্তিজীবন একাত্ম হয়ে ওঠে। ব্যক্তিমানস ও সমাজ মানসের সঙ্গে সম্পর্কের নিবিড়তা কবিমানসকে দেশকাল সম্পর্কে ব্যুৎপন্ন করে তোলে। তাঁকে শিল্পলোকে উত্তরণে সাহায্য করে। বিচিত্র জীবনচর্চা ও বিচিত্রপথগামী সাহিত্যকৃতির অধিকারী এই কবি কথাসাহিত্যিকের জন্ম সেপ্টেম্বর ১৯০৪ (মতান্তরে ১৯০৩) পিতার কর্মক্ষেত্র কাশীতে। পিতৃনিবাস ও হুগলী জেলার কোন্নগরে। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও মাতা সুহাসিনী দেবী। পিতা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং রেলের গাণনিক (অ্যাকাউন্ট্যান্ট)। মাও ছিলেন গুণবতী ও সংস্কৃতি মনস্কা। সাত আট বছর বয়সকালে মাতৃবিয়োগ হলে মাতামহীর স্নেহছায়ায় লালিত হন। মাতামহ ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল ওয়েজের মীর্জাপুর ভুক্তির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। প্রেমেন্দ্রর বাল্যকাল আর প্রথম কৈশোর কেটেছে মীর্জাপুরেই। সেখানেই বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি শিক্ষার হাতেখড়ি। মাতামহর মৃত্যুর পর তাঁকে নলহাটিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে আসতে হয়। নলহাটি হল গেরুয়া মৃত্তিকা আর শাক্ত-শৈব বৈষ্ণবসাধনার পীঠস্থান বীরভূমের আধাশহর এলাকা। এখানেই এক মাইনর স্কুলে প্রেমেন্দ্রর প্রথাগত ছাত্রজীবন শুরু হয়। কিছুকাল পরে নলহাটির বাস সমাপ্ত হল। কলকাতায় এসে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বান স্কুলে। এই বিদ্যালয়েই পরবর্তীকালে 'কল্লোল'-এর অন্তরঙ্গ সহচর অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা ১৯২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এই সুদর্শন ও মেধাবী সদ্যযুবকটি ভর্তি হলেন স্কটিশচার্চ মহা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে। পাঠ অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেন শ্রীনিকেতনে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করতে। সেখানেই এল্‌মহার্স্টের সংস্পর্শে আসেন আর পৌষমেলায় অভাবিত সুযোগ পেলেন

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রণতি জানাবার। কিন্তু তাঁর অনিকেত মনন কোনোস্থানে তাঁকে স্থিতিশীল হতে দেয় না। একবার কলকাতায় এসে আর ফিরে গেলেন না। ভর্তি হয়ে গেলেন সাউথ সুবাধান কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। এইসময় একবার ঢাকা গিয়ে ফিরতে চাইলেন না। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। আবার ঠাঁইনাড়া—কলকাতায় এসে জীবিকাসন্ধান।

কর্মজীবনের অধ্যায়টিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাধ ছিল চিকিৎসক হওয়ার। কিন্তু নিয়তিনির্দিষ্ট পথ যে অন্য বাঁকের প্রতীক্ষায়। ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পর পর দুটি ছোট গল্প 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিণী' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হতেই জীবনের দিশা পরিবর্তিত হল। এরপর তো শুধু 'সাহিত্যের কামড়', একবার ধরলে যা আর ছাড়ে না। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকা যা উত্তররৈবিক বাংলা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। কল্লোলের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রর নিবিড়, অতি নিবিড় যোগসূত্র সর্বজনবিদিত। সেইসময় তিনি চড়ক্‌ডাঙা এম, ই, স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। আট-দশ মাস পরে সেই চাক্‌রী ছেড়ে রাজগঞ্জে এক টালিখোলার ব্যবসায় নিয়োজিত হন। এরপর অকস্মাৎ ঝাঁ-ঝাঁয় স্বেচ্ছা নির্বাসন। তখনকার ঝাঁ-ঝাঁর শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে একটি মধুর ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভলো করে উপলব্ধি করার সুযোগ পেলেন। ঝাঁ ঝাঁ থেকে কর্মসন্ধানে কাশী এবং সেখান থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

কলকাতায় ফিরে এসে ড: দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক হিসেবে কাজ শুরু করেন। 'কল্লোল'-এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তো ছিলই, প্রেমেন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা মিলে 'আভ্যুদায়িক' সাহিত্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গে চলে অবিরাম সাহিত্যচর্চা। ১৯৮৮ সালে 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রিকায় সহসম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এবং কী আশ্চর্য, কিছুদিন পরে সে পদও পরিত্যাগ করে আবার পূর্বপদে বহাল হলেন। কিছুকাল পরে আবার পদপরিবর্তন। প্রথমে 'সংবাদ' ও পরে 'খবর' পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে 'বেঙ্গল ইমুইনিটি'তে যোগদান করেন—কার্যকাল মাত্র ছমাস। ১৯৩৩ সালে 'রং মশাল' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন এবং ১৯৩৬ সালে 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত হন। অচিরেই সেই দায়িত্বভার ত্যাগ করে পরবর্তী দু দশক ব্যাপৃত থাকেন ছায়াছবি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে। ১৯৫৪ সালে বোম্বাই গেলেন 'ফিল্মিস্তান কোম্পানী'তে তিন বছরের চুক্তিতে। ১৯৫৫ সালে সেখান থেকেও কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই ফিরে আসেন এবং 'আকাশবাণী' কলকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসাবে যোগদান করেন। তিন বছর কর্মরত থাকেন এখানে এবং পরবর্তী তিন বছর ওই সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় উপদেষ্টা নিয়োজিত হন। ১৯৬২ সালে তাঁর নিজের কথায় 'দাসীবৃত্তি' ত্যাগ করে আমৃত্যু সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। ১৯৭৬ সালে 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বিচিত্র, বিক্ষিপ্ত কর্মজীবনের অনেক সময় 'ভাঙাচোরা' 'দোমড়ানো তোবড়ানো' অবস্থাতেও তাঁর শক্তিশালী কলমটিকে বিশ্রাম দেন নি। জীবনের বহু বিস্তারী অভিজ্ঞতা প্রেমেন্দ্র মিত্রর ক্ষেত্রে জীবন বীক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে। চলার পথে বহুধা চয়ন তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও অন্যসৃষ্টিকে ঋদ্ধ করেছে।

বহুমাত্রিক লেখক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ৫০, ছোটগল্প সংকলন ৩০, অনুবাদগ্রন্থ ৬, নাটক ৪, শিশু ও কিশোর সাহিত্য গ্রন্থ ৩০, ছড়া সংকলন ৮, প্রবন্ধগ্রন্থ ৩, স্মৃতিকথা ৮, কল্প-বিজ্ঞানভিত্তিক লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অবিস্মরণীয় 'ঘনাদা' এবং 'পরাশর' গোয়েন্দাকে নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থেরও জনক এই লেখক। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা পনেরোটি। প্রায় ৭০টি ছায়াছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যের স্রষ্টা তিনি। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত রচনাতেও পিছিয়ে থাকেন নি তিনি।

ঊনিশ কুড়ি বছর বয়সে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলে ও কবি হিসেবে তাঁর আবির্ভাব বেশ বিলম্বিত। ঊনত্রিশ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা', এরপর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পায় আরো আটটি কাব্যগ্রন্থ—সম্রাট (১৯৪০), ফেরারীফৌম (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), কখনো মেঘ (১৯৬০), হরিণচিতা চিল (১৯৬১), অথবা কিন্নর (১৯৬৫), নদীর নিকটে (১৯৭১) এবং নতুন কবিতা (১৯৮১)। কাব্য গ্রন্থগুলির কাল অনুধাবন করলে প্রতীয়মান হয় যে, কথা সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সৃজনের ব্যাপ্তি ও লোকপ্রিয়তা এবং ছায়াছবির জগতে ব্যস্ত জীবনচর্চা তাঁর কবিজীবনকে কিছুটা বিঘ্নিত ও অবগুণ্ঠিত করেছে। ১৯৫৭ সালে 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য এ্যাকাদেমী পুরস্কার এবং ১৯৫৮ সালে ঐ কাব্যের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থটি বহুল প্রচারিত ও পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পূর্বোক্ত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের অনবদ্য ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণে প্রবাসী হয়েছেন—"আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোন্‌খানে থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহা যুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। আধুনিক বাংলা কাব্যবিচারে এখনো পর্যন্ত এইটিই স্বীকৃত সংজ্ঞা। কোন কোন আলোচক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসার, বর্তমান জীবনে নৈরাশ্য ও ক্লান্তিবোধ, আত্মবিরোধ ও অনিকেত মনোভাব, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব প্রভৃতি বারোটি লক্ষণকে চিহ্নিত করেছেন। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতি শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ, গদ্যছন্দের ব্যবহার এতদ্‌সম্পর্কিত আরো বারোটি রীতিকে আধুনিক কবিতা সনাক্ত করণের মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুবাদগ্রন্থ 'শার্ল বোদ্‌লেয়ার: তাঁর কবিতার সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকার ঘোষণা করলেন—'যা কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্লুর দ্য মাল' (যার বাংলা করা হয়েছে ক্লেদজ-কুসুম) এবং সেজন্য তাঁর মতে, আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭। বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় প্রথম চিত্রায়িত হল নাগরিক জীবনের ক্লেদ, গ্লানি, বিষাদ ও প্রসাধনিক

কৃত্রিমতা, দর্পণের সম্মুখে কবির নিরন্তর আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষা। এইভাবেই তাঁর চেতনার উন্মেষ। আর্তুর র‍্যাঁবো তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন তিনি 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'—এবংবিধ ভাষায়। মালার্মে এবং ভের্লেনও মুক্তকণ্ঠে 'ফ্ল্যুর দ্যুমাল' এর কবিকে অকৃপণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার বিশ্ববাসীর কাছে নবচেতনার দ্বার উন্মোচিত করলো। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relatively) এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রকাশিত হল। কম্যুনিস্ট 1848 ম্যানিফেস্টো এবং ১৮৬৭-তে প্রকাশিত 'দাস ক্যাপিটাল' অর্থনীতি, মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত করলো। ১৮৫৭তে প্রচারিত ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানবেতিহাসের নবব্যাখ্যাতারূপে প্রকাশিত হলো। সিগ্‌মাণ্ড ফ্রয়েড কৃত 'Interpretation of dreams' এবং ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'These contributions to the Theory of Sen'মানবমনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা করলো। এ সবই আধুনিক কবিতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করলো। ফ্রয়েড নরনারীর সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। মানসিক চেতনার স্তরকে তিনটি বিভিন্নভাবে ভাগ করলেন তিনি। চেতন (conscious) অবচেতন (Preconscious or subconscious) এবং নির্জ্ঞান (unconscios)। মানবমনে ইগো (ego), ইড্ (id) এবং সুপার ইগো (super ego)র জটিল সমস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এযাবৎ পুষ্ট ধ্যানধারণার ভিত্তিভূমিটা টালমাটাল করে দিল। 'হৃদয়পুরে চলিতেছিল জটিল খেলা।' মানুষ-মানুষীর সম্পর্ক যে যৌনগন্ধী সেই তত্ত্ব প্রচারের ফলে নীতি-দুর্নীতির বিভেদ রেখাটি ক্ষীণ হয়ে গেলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসী বিশেষ করে ইওরোপবাসীকে করে তুললো হতাশাগ্রস্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ। এই বিষন্ন মানুষের ছবি প্রতিফলিত হল টি. এস্, এলিয়ট ও অনুবর্তী কবিদের সৃষ্টিতে। এর আগেই অবশ্য এজ্‌রা পাউণ্ড আধুনিক কবিদের জন্য 'A few Don't' এর তালিকা তৈরী করে ফেলেছেন। এঁরা সব অগ্রজ রোমান্টিক কবিদের অতীন্দ্রিয় ঐন্দ্রজালিকতার মোহাঞ্জনকে বিদায় জানাতে বদ্ধপরিকর। মনোলোভা তরুণী প্রেমিকা হোল 'hyainth girl' —দেহসর্বস্ব যৌনতার প্রতীক। এক ধরনের নেতিবাদ, কৃত্রিমতা, ঘৃণা, তিক্ততা, হতাশা, বিতৃষ্ণা আধুনিকতার বিজয়পতাকা বহন করে চললো। কুৎসিতের পূজাবেদীমূলে সৌন্দর্যের বলিদান। সৌন্দর্য ও সত্যকে অভিন্ন দেখেছিলেন রোমান্টিক সাহিত্যিকবৃন্দ। আধুনিক পন্থীরা এর বিরোধিতায় সরব হলেন, অসুন্দরের ভেতর থেকে সৌন্দর্য নিষ্কাশনে প্রয়াসী হলেন তাঁরা। শূন্যতার বহিঃপ্রকাশ বাঙ্ময় হয়ে উঠলো। আত্মগতভাবের প্রকাশ হলো নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মোড়কে। অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা, মৃত্যুচেতনা, স্ববিরোধ, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিকতার মানদণ্ড হয়ে উঠলো।

সাহিত্যে এই পশ্চিমী আধুনিকতার তরঙ্গোচ্ছ্বাস বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে আছড়ে পড়লো। বাংলা সাহিত্যে স্বমহিমায় বিরাজিত সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ সর্বধাত্রী সৌরশক্তিসম। 'সম্মুখে পথজুড়ি বসে আছেন রবীন্দ্রঠাকুর।' রবীন্দ্রনাথের ছিল নিষ্কম্প মঙ্গলচেতনা। যুদ্ধোত্তর অস্থিরতা, ছিন্নমূল বিষাদ, অবিশ্বাস, মন্বন্তর, নৈরাজ্য, সমাজ-পরিবার, প্রকৃতি ও পরবেশ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক বাংলা কবিতার কেন্দ্রীয় উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠলো। অশুভ শক্তির কাছে, অকল্যাণের ভয়াল প্রভাবের কাছে মানুষের সাময়িক পরাজয়চেতনা আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যের মূলে সুর হয়ে উঠলো। কবতা হয়ে উঠলো প্রতিস্পর্ধী স্বরলিপি। স্পর্ধিত পদক্ষেপে নতুনের কেতন উড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করলো 'কল্লোল' সাহিত্য পত্রিকা ১৯২৩ সালে, 'কালি ও কলম' এবং 'প্রগতি' অনুবর্তী হোল।

সর্বাঙ্গে সময়ের টিপছাপ নিয়ে বিদ্রোহের সময়পতাকা স্কন্ধে তুলে নিলেন যে সব সমমনস্ক কবি তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৩), জীবনানন্দ দাশ (১৮৩৯-১৯৫৪), অজিত কুমার দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) এবং আমাদের বর্তমান আলোচ্য কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)।

সমাজসচেতনতার এক স্পর্ধিত দৃপ্ত উচ্চারণে প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতার জগতে পাদচারণ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বেদনাবিদ্ধ জীবনের ম্লানতা ও বিধ্বস্ত সমাজজীবনের জন্য কবির অন্তর্বেদনা এবং এই বেদনাসঞ্জাত ক্ষোভকে অহেতুক অলংকারবর্জিত, সুসংবদ্ধ প্রকাশভঙ্গীতে প্রকাশ করে অচিরেই পাঠকচিত্তজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনার চাইতে কাব্যগ্রন্থসংখ্যা কম হলেও প্রেমেন্দ্রমানস যথাযথ স্ফূরিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। 'অথবা কিন্নর' কাব্যে 'কবিতা' নামধেয় কবিতাটিতে গল্পের সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে বললেন 'গল্পে রেখো গেঁথে/সময়ের স্রোতে নিরুপায় ভাসতে ভাসতে/যা দেখলে শুনলে ভাবলে বুঝলে।' কিন্তু কবিতা? সে তো কবির হৃদয়মথিত যন্ত্রণার ফসল।

শুধু যখন যন্ত্রণার ঢেউ উঠবে
পাকা বনেদেরও তলা থেকে,
তোমার তুমিকেও ভেঙে চুরে,
প্রাণের পুতুল নাচের সুতো ছিঁড়ে
দুদণ্ডের জন্যে হবে স্বাধীন
তখন কবিতা লেখার চেষ্টা করো একটা।

কবিমানসের অন্তর্লীণ যন্ত্রণার উৎসমূলেই কবিতার বীজ প্রোথিত থাকে। এই যন্ত্রণাহত বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতায় এক প্রোন্নত এবং তরুণতর কবিদের মধ্যে পথিকৃৎ হিসাবে তিনি রসিক পাঠক সমাজে বয়ানে সমাদৃত হয়েছিলেন। কলুষিত সামাজিক বাতাবরণ, স্বার্থগন্ধী জীবনচর্চা, মানবতাহীন মূঢ়তা, সর্বগ্রাসী অবমূল্যায়ণ কবিচিত্তে যে অস্থিরতা এবং দোলাচলের সৃষ্টি করেছিল তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেয়েছি অমূল্য কবিতা সম্ভার। সর্বব্যাপী বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামগ্রিক জীবনবীক্ষা প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ প্রথমবার কবিতাগুচ্ছকে এক অনাস্বাদিত ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, সমাজচেতনা প্রতিভাত হয়েছে দর্পিত ভঙ্গীতে, স্পর্ধিত উচ্চারণে। পৃথিবীকে কবি তুলনা করেছেন 'মাটির ঢেলার সঙ্গে, মাটির ঢেলা দুঃখ দিতে ভুললো না, মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে। পৃথিবীর সন্তানরাও তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট অভিশপ্ত।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর সে ভাই আদিম অভিশাপ
বহিমোরা ঋণ
আকাশের আলো, যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই
আদি পঙ্কের ঋণ। (লক্ষ্যভ্রষ্ট)

(চলবে)